ISSN 2789-1062

অপু সরোয়ার *

বেলার মাঠের গণহত্যা

[আলোচ্য প্রবন্ধে জয়পুরহাট জেলা শহর থেকে ষোল কিলোমিটার দক্ষিণে ঐতিহাসিক পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার থেকে সাত কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত আক্কেলপুর এলাকার বেলার মাঠের গণহত্যা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে । ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর, রাজাকার এবং শান্তি বাহিনীর সদস্যরা আক্কেলপুরে দফায় দফায় নির্যাতন ও গণহত্যা সংঘটিত করে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা জয়পুরহাট, নওগাঁ ও বগুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে নির্মম ধ্বংশযজ্ঞ চালায়। জয়পুরহাট ও আশে পাশের অঞ্চলে পৌঁছার পর পাকিস্তানী মিলিটারিদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে জানমালের নিরাপত্তা তথা ইজ্জতের ভয়ে জনগণ ভারতে পালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ১৫ জুন পলায়নরত কিছু লোককে গাড়োয়ানরা (গরু ও মহিষের গাড়ী চালক) ভারতীয় সীমানায় রেখে আসার পথে প্রায় ১৯ জন গাড়োয়ানকে গ্রেফতার করে জয়পুরহাট শান্তি কমিটির অফিসে নিয়ে আসা হয়। রাতে সেখানে বন্দী করে রেখে পরদিন ট্রাকে করে শামীম বিহারীর নেতৃত্বে তাদের আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় স্থাপিত পাকিস্থানী মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ভালক্যা বাঁশের মোটা গোড়া দিয়ে কুপিয়ে, পিটিয়ে ও গলাকেটে হত্যা করা হয়। পরে জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার পৌরসভার অন্তর্গত আমুট্ট গ্রামের বেলার মাঠে গণকবর দেয়া হয়। পরবর্তীতে জুন মাস হতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যবর্তী সময়ে আমুট্ট গ্রামের বেলার মাঠে কয়েক দফা গণহত্যায় প্রায় আরও ৪০ জন লোক নিহত হয়। লোকমুখে কেউ কেউ বলেছেন মৃতের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ও তার বেশি। কিন্তু এই অগনিত নিহত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা পাওয়া যায়নি।

সূচক শব্দ : জয়পুরহাট, গণহত্যা, আক্কেলপুর, শান্তি কমিটির]

ভৌগোলিক অবস্থান

জয়পুরহাট জেলা রাজশাহী জেলার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। জয়পুরহাট জেলার উত্তরে দিনাজপুর জেলা ও ভারত, পূর্বে গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে বগুড়া এবং নওগাঁ জেলা, পশ্চিমে নওগাঁ জেলা এবং ভারত অবস্থিত।

জয়পুরহাট জেলার আয়তন ৯৬৫.৪৪ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯০৪ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার। ১৯০৭ সালে জয়পুরহাটে একটি পৃথক থানা গঠিত হয়। ১৯১৮ সালে জয়পুরহাট থানা ভবন নির্মিত হয় এবং পাঁচবিবি জয়পুরহাট থানার উত্তর সীমা রূপে নির্দিষ্ট হয়। ১৯৭১ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে জয়পুরহাট মহকুমার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে জয়পুরহাট মহকুমা থেকে জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

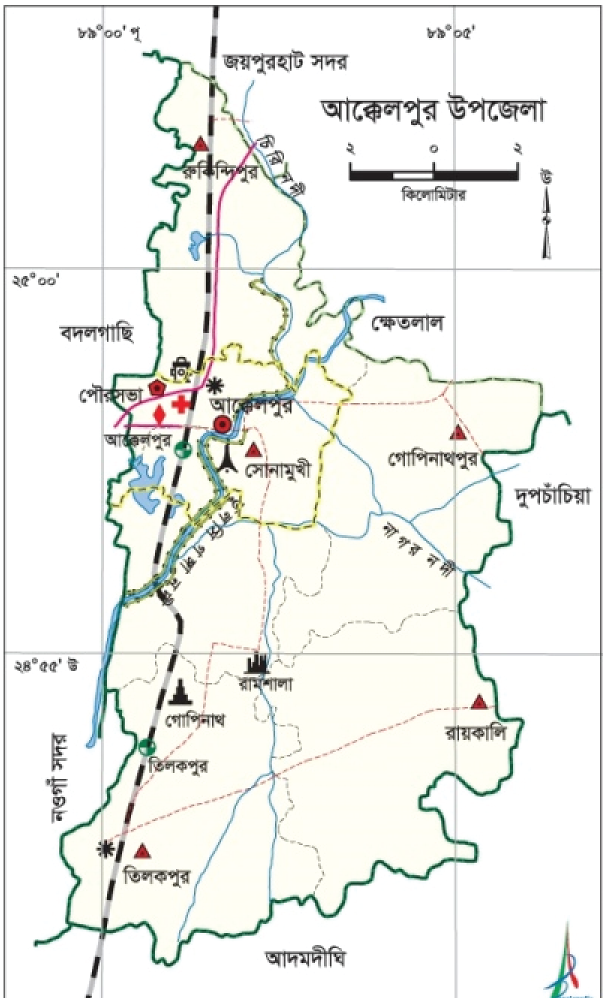

আক্কেলপুর উপজেলার মানচিত্র *সৌজন্যে : বাংলাপিডিয়া*

জয়পুরহাট জেলা ৫ টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। উপজেলা গুলো হলো- আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল, কালাই, পাঁচবিবি, এবং জয়পুরহাট সদর।

আক্কেলপুর উপজেলার আয়তন ১৩৯.৪৭ বর্গ কিলোমিটার। ২৪.৫১ এবং ২৫.০৩ ডিগ্রী উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৮৮.৫৪ ও ৮৯.০৬ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে আক্কেলপুর উপজেলার অবস্থান। এ উপজেলার উত্তরে জয়পুরহাট সদর ও ক্ষেতলাল উপজেলা, পূর্বে ক্ষেতলাল ও বগুড়া জেলার দুঁপচাচিয়া উপজেলা, দক্ষিণে বগুড়া জেলার আদমদিঘী, পশ্চিমে নওগাঁ জেলার সদর উপজেলা ও বদলগাছি উপজেলা অবস্থিত।

আক্কেলপুর জয়পুরহাট জেলার সবচেয়ে ছোট উপজেলা। এক সময় আক্কেলপুর এলাকায় তুলসীগঙ্গা নদীর তীরে প্রসিদ্ধ হাট ছিল সোনামুখীর হাট। পরবর্তীতে আক্কেলপুর রেলস্টেশন স্থাপিত হয় এবং কালক্রমে রেলস্টেশন সংলগ্ন তালতলী নামক একটি হাট বসে। সোনামুখী হাট কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। উপজেলায় রয়েছে একটি পৌরসভা ও পাঁচটি ইউনিয়ন পরিষদ।

আমুট্ট গ্রামটি আক্কেলপুর পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত। জয়পুরহাট বগুড়া সড়ক হয়ে আক্কেলপুর উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদ থেকে দেড় কিলোমিটার পথ বেয়ে আক্কেলপুর টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ। আক্কেলপুর মহিলা কলেজের পশ্চিম প্বার্শে আমুট্ট মৌজায় বেলার মাঠ বধ্যভূমি অবস্থিত।

স্থানটির তৎকালীন অবস্থা

আমুট্ট গ্রামের অধিকাংশ লোকের পেশা ছিল কৃষি কাজ। এছাড়া কিছু সংখ্যক লোক ব্যবসা বাণিজ্য করত। কেউ কাপড়ের ব্যবসা করতো। কেউ আবার মুদিখানা, তৈজসপত্র, পাট কেনা বেচা করত। যাতায়াতের রাস্তাঘাট ছিল কাচা মাটির তৈরি। মানুষ পাঁয়ে হেঁটে ও সাইকেলে চড়ে যাতায়াত করতো। মাল পরিবহনে গরু ও মহিষের গাড়ি ব্যবহার করা হতো। অধিকাংশ বাড়িতে ছিল মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনি। দোকান ঘর ছিল টিনের ও মাটির। শতকরা চল্লিশ ভাগ লোক লেখাপড়া জানতো। অধিকাংশ লোক ছিল স্বল্প শিক্ষিত। তবে এই এলাকার মধ্যে কানুপুর গ্রামের বেশির ভাগ লোক শিক্ষিত ছিল।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

আক্কেলপুর উপজেলা সদর হতে ১.৫ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত আমুট্র গ্রাম। বেলার মাঠের দক্ষিণে ফকিরপাড়া, পূর্বে রেললাইন আমুট্র বিহারপুর, উত্তরে বেগুনবাড়ি-কানুপুর, পশ্চিমে পশ্চিম আমুট্র, আক্কেলপুর। তৎকালীন সময়ে আমুট্র মৌজায় ২৫-৩০ টি পুকুর ছিল। বর্তমানে বেশির ভাগ পুকুর ভরাট হয়ে গেছে। তৎকালীন সময়ে এই মৌজায় কোন প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল ও কলেজ তথা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখানে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের হিন্দু স্কুল ও লাইব্রেরি ছিল। পরে পঞ্চাশের দশকের প্রখ্যাত কবি ও নজরুল গবেষক কবি আতাউর রহমান (বাড়ি আক্কেলপুর) ও মাড়োয়ারি তরুণ বামপন্থি কর্মী ওল্কারমল মোর এর উদ্যোগে ধর্মশালাটি আক্কেলপুর আদর্শ ক্লাব ও রাষ্ট্রীয় পাঠাগারে রূপান্তরিত হয় ১৯৫৫ সালে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানেই স্বাধীনতাকামী ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলোর মূল যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল।

গণহত্যা-নির্যাতনের পটভূমি

ছাত্র রাজনীতির প্রভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশের ছাত্র সমাজ ১১ দফা আন্দোলনে এতটা সক্রিয় ছিলো যে, জয়পুরহাটের ছাত্র সমাজের ওপর তা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্র লীগের কার্যক্রম একমাত্র কলেজ ও স্কুল পরিধির বাইরে অর্থাৎ শহরে মিছিল মিটিং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছিল। তখন কে এম ইদ্রিস আলী মন্ডল, লুৎফে আকবর চৌধুরী (সর্বজনের কাছে যিনি রাজা চৌধুরী নামে জনপ্রিয় ছিলেন), নির্মল কুমার মন্ডল, ফরিদুর রহমান বাবুল, আমজাদ হোসেন, মুকুল চৌধুরী, স্বপন কুমার খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছাত্র নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর জাতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক গতি এলেও তৎকালীন আওয়ামীলীগের জয়পুরহাটের নেতৃত্ব শক্তিশালী না হওয়ায় ছাত্র সমাজের উপরই মূলত আন্দোলন নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। সে সময়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে জালাল মন্ডল, কাফেজ উদ্দিন মন্ডল, ন্যাপের মীর শহিদ মন্ডল, খয়বর আলী মিয়া, মজিবুর রহমান সহ ছাত্রদের সংগে একমাত্র সেতুবন্ধনকারী আওয়ামীলীগ নেতা মহাতাব আলী মন্ডলের কর্মকান্ড ছিল লক্ষণীয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর পূর্বে যখন দেশে স্বাধিকার আন্দোলন চলছিল এর মাঝে শহিদ আসাদ দিবসে জয়পুরহাট বাসী প্রত্যক্ষ করলো আন্দোলন

বড় একটা ইস্যু। সে সময় আওয়ামীলীগ নেতা মহাতাব আলী মন্ডল, রাজা চৌধুরী , শ্রমিক নেতা আব্দুল আজিজ সহ কয়েকজন নেতা এই আন্দোলন সংগঠিত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২০ শে জানুয়ারি জয়পুরহাট চিনিকলের শ্রমিকদের সংগঠিত করে বড় মিছিল বের হয়। এ মিছিলের ফাঁকে শহরের প্রধান সড়কে অবস্থিত মুসলিম লীগের অফিস ব্যাপকভাবে ভাংচুর হয় এবং এ ঘটনার পরই যেন শহরে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিলো। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানকে সরিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ক্ষমতা নেয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য স্থানের ন্যায় জয়পুরহাটেও এর প্রভাব পড়েছিলো। আরোও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সারাদেশের মানুষের ন্যায় জয়পুরহাটের মানুষও।

গণ অভ্যুত্থানের পর ধাপে ধাপে সারা দেশের ন্যায় জয়পুরহাটেও আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এরই মাঝে রাজশাহীতে শহিদ শামসুজ্জোহার মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালিরা যে স্বাধিকারের জন্য সংগ্রাম করে আসছিলো তাতে জয়পুরহাটের অনেক নেতাকে অত্যাচার-নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। গণ আন্দোলনের মধ্যে গ্রেফতার হন আওয়ামীলীগ নেতা মহাতাব আলী মন্ডল, ছাত্র নেতা স্বপন কুমার খাঁ, এ ছাড়া গ্রেফতার হন আবুল কালাম আজাদ ও ওয়াজেদ আলী সরদার। তাদের গ্রেফতারের পর জয়পুরহাটের মানুষ আরও ফুঁসে উঠে। ব্যাপক আন্দোলনের মুখে তারা বগুড়া জেল থেকে মুক্তি পান। গণ আন্দোলনে অগ্নিঝরা দিন গুলিতে জয়পুরহাট শহর ছাত্রদের দ্বারা প্রতিদিনই উত্তপ্ত থাকতো। ছাত্র নেতা রাজা চৌধুরী, রঞ্জন সরকার, আব্দুল ওহাব, মোজাহার আলী, স্বপন কুমার খাঁ, ইদ্রিস আলী মন্ডল মুলত আওয়ামীলীগের ও অন্যান্য বাম দলের চালিকাশক্তি ছিলেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী ডঃ মফিজ চৌধুরীর জন্য নির্বাচনে জয়লাভে বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়নি। কেননা ঐ সময় বঙ্গবন্ধু জয়পুরহাট রেল স্টেশনে যে জনসভা করেছিলেন তা এখানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তাঁর বক্তব্যে জয়পুরহাটের মত অল্প শিক্ষিত জনপদেও গণচেতনা, যা শুধু মাত্র ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলো তা ভেঙ্গে খান খান হয়ে নৌকা প্রতীকে ভোট দানে একত্রিত করেছিলো। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামীলীগের বিরাট সাফল্যের পর দেশের রাজনীতি নতুন করে মোড় নিতে শুরু করে। ঢাকার

পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের উদ্যোগে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়েই যেন নতুন দেশের আকাঙ্খা সবার মধ্যে তীব্রভাবে জেগে উঠে। ঢাকায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের পর জয়পুরহাটেও এর প্রভাব পড়ে। রাজা চৌধুরী সহ বিভিন্ন নেতারা আলকেচ মিয়ার কাছ থেকে বাংলাদেশের পতাকা বানিয়ে নিয়ে তা সরকারী ডাক্তারখানার মাঠে (আজকের শহিদ ডাঃ আবুল কাশেম ময়দান) আনুষ্ঠানিক অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ কায়দায় উত্তোলন করেন। নির্বাচনোত্তর গণ সংগ্রামের দিনে জয়পুরহাটের রাজনীতিতে ভূমিকা রেখেছিলেন বাবু মোহন লাল বাজলা, নুরুল মন্ডল প্রমুখ। এ সময় বর্তমানের আবুল কাশেম ময়দানে(সেদিনের সরকারী ডাক্তার খানার মাঠ) প্রায় প্রতিদিনই মিটিং লেগে থাকতো। আজ ছাত্র ইউনিয়ন, কাল ছাত্রলীগ, পরশু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পর স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সারা দেশের ন্যায় জয়পুরহাটেও এর জাগরণ দেখা যায়। জয়পুরহাটেও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। জয়পুরহাট চিনিকলের গ্যারেজে ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন ইদ্রিস, আনোয়ার হোসেন, হাফিজার রহমান এবং কালু ভাইয়ের দ্বারা বিস্ফোরক দ্রব্যদির কার্যক্রম শুরু হয়। অস্ত্র হাতিয়ার তৈরি সহ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা তৈরীর কাজ শুরু করা হয়। জয়পুরহাট সরকারী কলেজে শাকিল আহম্মেদ, মহাতাব মন্ডল ও ইপিআর এর কয়েকজন সদস্যদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়। প্রতিদিন সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রায় তিন শত সদস্য নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। আজিজুল বারী প্রশিক্ষণ কমান্ডার হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সময় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডিএসবির বড়ুয়া বাবু এবং টেলিফোন অপারেটর মোসলিম উদ্দিন বিশেষ অবদান রাখেন। এছাড়া সেনাবাহিনীর মেজর নাজমুল প্রায়ই এসে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান করতেন।

সংগ্রাম পরিষদের ড. মফিজ চৌধুরী ও কাফেজ উদ্দিন মন্ডলের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে যে রাজনৈতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয় সে সময় অধ্যাপক খাজা শামসুল আলম, অধ্যাপক এমদাদুল বারী, আনিসুর রহমান, মোঃ আলাউদ্দিন, আব্দুল খালেক, আবুল হাসনাত চৌধুরী, ডা. সাইদুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সার্বক্ষণিক জনগণের পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সে সময় প্রতিদিন বিবিসি সংবাদ শোনার জন্য বিভিন্ন জায়গায় মানুস ভিড় জমাতো। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে জয়পুরহাট জেলার পশ্চিম ও উত্তরের কিয়দংশ ভারত সীমান্তবর্তী হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি

হানাদাররা জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরোধ এবং সংঘবদ্ধ আক্রমণ সুকঠিন শাসনের লক্ষ্যে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি গড়ে তোলে। তারপর শুরু করে অত্যাচার-নিপীড়ন ধর্ষণ নির্যাতন ও গণহত্যা।

পাকিস্তানি সেনারা সান্তাহার হতে ট্রেনযোগে আক্কেলপুরে প্রবেশ পথে হলহলিয়া ব্রিজের নিকটে ভদ্রখালী গ্রামে বেশ কিছু বাড়িতে আগুন লাগায় এবং লুটপাট চালায় ও আতংকের সৃষ্টি করে। তখন বেশ কটি মর্টার শেলের আওয়াজ পাওয়া যায়। আক্কেলপুরের মানুষ সেদিন প্রাণভয়ে বাড়িঘর, দোকানপাট ছেড়ে আশ পাশের মাঠের মধ্যে আশ্রয় গ্রহন করে।

আক্কেলপুর স্টেশনে ট্রেন সকাল ১০/১১ টায় এসে পোঁছার পর স্থানীয় কিছু সংখ্যক মানুষ তৎকালীন পাকিস্তানি স্টেশন মাস্টারের আহবানে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেনা কর্মকর্তারা আক্কেলপুরের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান। পাকিস্তানি পতাকা হাতে নিয়ে সাদা টুপি মাথায় দিয়ে তারা স্টেশনে যান। তার অর্থ দাঁড়ায় তাদের অনুগত হওয়া বা তাদের নিকট আত্নসমর্পন করা। তা না হলে সব কিছু ধ্বংস করে তামা করে দিবে বলে সেনারা হুংকার ছাড়তো। যারা তখন এখানে বসবাস করতেন তাদের এছাড়া বাঁচার আর কোন উপায় ছিল না। তখন মরহুম ইয়াকুব আলী কবিরাজের ভবনের একতলায় ছিল হাবিব ব্যাংক (আক্কেলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে)। এই ব্যাংকের পাকিস্তানি ম্যানেজার এ কাজে মধ্যস্থতা করতেন। এক সময় পাকিস্তানি সেনারা বর্তমান কিশোরের মোড় এলাকায় সমবেত হয়। এ সময় ধীরে ধীরে সেখানে স্থানীয় বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ জমায়েত হয়।

এক সময় পুরাতন বাজারের কিছু বন্ধ দোকান পাট ও মাড়োয়ারী পরিবারের বাড়িঘর লুট পাট হওয়া শুরু হয়।

পাকিস্তানি সেনাদের নিক্ষিপ্ত একটি মর্টার শেল শ্রী দুর্গাদত্ত আগরওয়ালার একতলা ভবনের বারান্দার দেয়ালে (পশ্চিম পাশে) আঘাত করে। ফলে দেয়ালে একটি বড় ছিদ্র হয়ে যায় যা দীর্ঘকাল যাবৎ "মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন" হিসেবে মানুষের মনে দাগ কেটে রয়েছে। পরবর্তীতে এ ভবনে পুলিশ ও রাজাকার ক্যাম্প করা হয়েছিল এবং বিজয়ের পর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প হয়েছিল। এরপর সেদিনের মতো অপারেশন শেষ করে ট্রেনযোগে সান্তাহারের দিকে ফিরে চলে যায় পাকিস্তানি বাহিনী।

গণহত্যা-নির্যাতনের বিবরণ

১৯৭১ সালের আনুমানিক ১৫ জুন এই গণহত্যা সংঘঠিত হয় (সুস্পষ্টভাবে তারিখ পাওয়া যায়নি)। বেলার মাঠ আক্কেলপুর বাজার থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব দিকে পশ্চিম আমুট্র মৌজায় মহিলা কলেজের পাশে অবস্থিত। চতুর্দিকে ধানক্ষেত, পূর্বদিকে রেললাইন। পশ্চিমের রাস্তা ধরে ১৯৭১ সালে হাজার হাজার শরণার্থী ভারতে গিয়েছিলেন। বগুড়া , নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকার শরণার্থীদের ভারতে যাবার পথ ছিল এটা। পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প ছিল অদূরেই আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসায়। তাদের সহযোগী রাজাকারদের সহায়তায় শরণার্থীদের আটক করে বেলার মাঠে নিয়ে এসে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। আবার অন্য জায়গায় হত্যা করেও লাশ এখানে এনে ফেলে দিয়েছে।

শরণার্থীদের মধ্যে বয়স্ক, অসুস্থ, গর্ভবতী মা, শিশু যারা দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, আক্কেলপুরের বিভিন্ন এলাকার স্বাধীনতাকামী মানুষ তাঁদের বিশ্রাম এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি যাদের গরুর গাড়ি কিংবা মহিষের গাড়ি ছিল তাঁরা শরণার্থীদেরকে গাড়িতে চড়িয়ে ভারতে যেতে সাহায্য করতেন। বিভিন্ন অঞ্চলের শরণার্থী গোপীনাথপুর, আক্কেলপুরের উপর দিয়ে গরু মহিষের গাড়িতে মালামালসহ বর্ডার পার হয়ে ভারতে যেত। ২৭ টি গরু মহিষের গাড়ি ও গাড়োয়ানরা হিন্দু পরিবারও জিনিসপত্র নিয়ে নিয়মিত ভারতে যাওয়া আসা করতো।

১৯৭১ সালের ১৫ জুন হিন্দু পরিবারদের ভারতে পৌছে দিয়ে ফেরার পথে রাত নেমে আসে। জয়পুরহাট জেলার বর্তমান মঙ্গলবাড়ি ডিগ্রী কলেজ সম্মুখ ব্রিজে আনুমানিক ২৭ টি গরু মহিষের গাড়ি অপেক্ষা করছিল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়োয়ানরা বিশ্রাম নিচ্ছিলো। এমতাবস্থায় এশার নামাজের সময় পর ৩০-৪০ জন শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারেরা অস্ত্র নিয়ে গরুর গাড়ির চারেদিকে অবস্থান নেয়। গাড়োয়ানরা দেখলো বাঁচার উপায় নেই।

গরু মহিষের গাড়ির ভিতর গাড়োয়ানসহ অল্প সংখ্যক লোক ছিল। সশস্ত্র লোকজন দেখে গাড়ির বেশির ভাগ যাত্রীরা দৌঁড়ে পালানো শুরু করলো। আশে পাশে বহুদুর পর্যন্ত পাটের জমি ছিল। অস্ত্র দেখে ভীত হয়ে কয়েকজন গাড়োয়ান গরু মহিষের গাড়ি রেখে পাটের জমির মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। গরু মহিষ ও গাড়ি হারানোর ভয়ে ১৭ জন গাড়োয়ান গাড়ির মধ্যে থেকে গেল। গাড়োয়ানরা শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারদের বোঝানোর চেষ্টা করলো।

তারা কোন কথা শুনলো না। গরু মহিষের গাড়ি নিয়ে চলে গেল। গাড়োয়ানরা গরু মহিষের গাড়ি দিতে চাইলো না তাই তাদেরসহ নিয়ে গেল। একজন গাড়োয়ান যেতে না চাইলে তার পেটে ছুরি মেরেছিল। পেট থেকে ভুড়ি বের হয়ে সে মারা গিয়েছিল। রাজাকার ও বিহারিরা ঐখানে গুলি করে ও পেটে চাকু মেরে কয়েকজনকে মেরেছে।

হানাদার বাহিনী এই গরু, মহিষের গাড়ি চালক গাড়োয়ানদেরকেও রেহাই দেয়নি। উক্ত ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী গোপীনাথপুর ইউনিয়নের বারউল গ্রামের মো: হাফিজার রহমান বলেন, "গ্রামের যে গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি ছিল সেগুলো দিয়ে শরণার্থীদেরকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছি। তাঁদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে গাড়োয়ান আবু জোয়ারদার এবং তোফাজ্জল হোসেন শহিদ হয়েছেন।" আবু জোয়ারদারের বাড়ি গোপিনাথপুরে আর তোফাজ্জল হোসেন তোফার বাড়ি মাটিহাঁসে।

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* এর অষ্টম খন্ডে মো: গোলাম মোস্তফা মন্ডলের উদ্ধৃতিতে ১৬/১৭ জন গাড়োয়ান হত্যাকান্ডের কথা জানা যায়–

> "জুন মাসের মাঝামাঝিতে এমনিভাবে কতিপয় লোককে গাড়োয়ানরা বাংলাদেশের সীমানায় অর্থাৎ ভারত সীমান্তে রেখে আসার পথে রাজাকাররা ঐ সমস্ত ১৬/১৭ জন গাড়োয়ানকে গ্রেফতার করে জয়পুরহাট শান্তি কমিটির অফিসে নিয়ে আসে। রাতে সেখানে বন্দী করে রেখে পরদিন ট্রাকে করে শামীম বিহারীর নেতৃত্বে তাদের আক্কেলপুর মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ভালক্যা বাঁশের মোটা গোড়া দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ঐ সমস্ত গাড়োয়ানকে হত্যা করে।"

আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় পাকিস্তানিদের একটি বড় ক্যাম্প ছিল। প্রত্যক্ষর্শীর মতে সেখানে কয়েকশত সেনা থাকত। নূর মোহাম্মদের বাড়ি এই ক্যাম্পের পাশেই। তিনি মুক্তিযোদ্ধের নয় মাস বাড়িতেই ছিলেন। তিনি বলেন, অনেককে ধরে এনে এই ক্যাম্পে নির্যাতন করা হতো। নির্যাতনের পর হত্যা করা হতো। পরে মৃতদেহ বেলার মাঠে ফেলা আসা হতো। উল্লিখিত গ্রন্থেও যে, ১৬/১৭ জন গাড়োয়ান হত্যার কথা বলা হয়েছে, ধারণা করা হয় তাঁরা বেলার মাঠে শায়িত। নূর মোহাম্মদ জানান আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় বিশাল মিলিটারি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন ছিল মেজর আফজাল। তাঁর নেতৃত্বে এই ক্যাম্পে শতাধিক সৈন্য ছিল। রাত দশটার পর মিলিটারিরা

আশে পাশের গ্রাম থেকে লোক ধরে আনত। ধরে এনে মেরে ফেলতো। লাশ গাড়িতে করে অন্যত্র নিয়ে যেত। মিলিটারিরা রাতে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে লুটপাট করতো, আগুন লাগাতো, ধরপাকড় করতো। আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় স্থাপিত পাকিস্তানি সেনা ছাউনির অধিনায়ক ছিল অত্যান্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির অফিসার মেজর আফজাল। মাদ্রাসার বিভিন্ন কক্ষকে নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে সে ব্যবহার করতো। বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ জনগণকে ও মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে অনেককে ধরে এনে এখানে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করা হতো। তারা অনেক মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অমানুষিক নির্যাতনের পর হত্যা করে আশেপাশে মাটিচাপা দিয়ে রাখতো। বন্দি মুক্তিযোদ্ধাদের মাদ্রাসার নির্যাতন কেন্দ্রে রাজাকারদের সহায়তায় খেজুরের কাঁটার আঘাতে ও বেয়নেট চার্জ করে নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনের সময় মুক্তিযোদ্ধারা পানি পান করতে চাইলে তাদের পানির পরিবর্তে বলপূর্বক প্রসাব ও গরুর গবর খাওয়ানো হয়। রাজাকাররা ঐ সমস্ত ১৬/১৭ জন গাড়োয়ানকে গ্রেফতার করে আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। এই ক্যাম্পে নির্যাতন শেষে ১৭ জন গাড়োয়ানকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে তাদের লাশ বেলার মাঠে মাটি খুঁড়ে চাপা দেয়া হয়।

গণহত্যা-নির্যাতনকারীর পরিচয়

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত হয়। পাকিস্তানি আর্মিদের বেলার মাঠের গণহত্যা সংগঠনে রাজাকার ও শান্তি বাহিনীর সদস্যরা বিশেষ করে আমজদা, মোস্তফা, মকবুলসহ বেশ কয়েকজন সহযোগিতা করেছিল। এ এলাকার পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের পরিচয় পরিশিষ্টে রয়েছে।

শহিদ শনাক্তকরণ

১৯৭১ সালের ১৫ জুন তোফাজ্জল, আবের জোয়ারদার ষাঁড়ের এবং মহিষের গাড়ি নিয়ে ভারতীয় সীমান্তের ওপারে কিছু হিন্দুদের নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হন। আবের জোয়ারদার অসুস্থ হওয়ায় বাড়ি ফিরে আসেন। তার ছেলে মুখলেসুর রহমান হিন্দুদের ফেরি করার জন্য সীমান্তের ওপারে চলে যান।

সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা-৮টা নাগাদ শান্তি কমিটির সদস্য আব্দুল আলিমের স্থানীয় সহযোগীরা এবং রাজাকাররা গ্রামে ফেরার সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়তায় মোখলেস ও অন্যান্য ১৯ জন গরু ও মহিষের গাড়ি চালক গাড়োয়ানকে আটক এবং গলাকেটে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকারে জানা যায়, বেলার মাঠের গণহত্যায় কয়েকশত লোক নিহত হয়। বর্তমানে ১৭ জনের নাম ও ঠিকানা জানা যায়। (পরিশিষ্টে সংযুক্ত)

নির্যাতিত, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য

রাজেন্দ্র প্রসাদ আগরওয়ালা (৬৯)

রাজেন্দ্র প্রসাদ আগরওয়ালা

পিতা: জয়দেব আগরওয়ালা, গ্রাম: পুরাতন বাজার, ডাকঘর: আক্কেলপুর, উপজেলা: আক্কেলপুর, জেলা: জয়পুরহাট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর ২০২২।

২৪ এপ্রিল ১৯৭১ সাল। পাকিস্তানি আর্মিরা ট্রেনযাগে সান্তাহার থেকে আক্কেলপুরে আসে। প্রথমে তারা আক্কেলপুর আসার পথে আক্কেলপুর হলহলিয়া ব্রিজ পার হয়ে ভদ্রকালি গ্রামে শেল নিক্ষেপ করে এবং পুরো গ্রামটি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। সেখান থেকে পাকিস্তানি বাহিনী ট্রেনযোগে আক্কেলপুর স্টেশনে নামে। মিলিটারিরা স্টেশনে নামলে আশে পাশের গ্রামের মানুষ জন ভয়ে বিভিন্ন দিকে দৌঁড়াদৌঁড়ি শুরু করে। দুর্গা বস্ত্রালয়ের সামনে দালান ঘরে লক্ষী ও গণেশের মূর্তি ছিল ও ভবনের চারকোনে চারটি পরী মূর্তি ছিল। এগুলো দেখে পাকিস্তানি আর্মি সেল নিক্ষেপ করে। তখন বাজারের লোকজন পালাতে শুরু করলো। তারা মাইকে বলল ভয়ের কোন কারণ নেই এখানে আসেন। এখানে আক্কেলপুরের হাবিব ব্যাংক লিমিটেডের বিহারি ম্যানেজারকে ধরে নিয়ে এলো। তাকে জিজ্ঞেস করে, অবাঙালি বা বিহারিদের কেউ মারপিট বা হত্যা করেছে কিনা অবস্থা জানতে চাইলো। তিনি বললেন, এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি। বরং বিহারিদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তখন উৎসুক জনতা গাড়ির কাছে ভিড় করতে আরম্ভ করলো। পাকিস্তানি আর্মিরা জনতার সামনে বললো, আওয়ামীলীগের তথা হিন্দু মালাউনদের দোকানপাট, বাড়িঘর লুটপাট করে

নাও। অর্ডার দিয়ে চলে যাওয়ার পর ব্যাপকভাবে লুটপাট শুরু হলো। সাধারণ মানুষ লুটপাট শুরু করলো। চকতাহের, খাদাইল, মিঠাপুর, আমুট্র, হাস্তাবসন্তপুর, বিহারপুরের মানুষ জন এসে লুটপাট শুরু করলো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চলন্ত ট্রেন থেকে বর্তমান আক্কেলপুর মহিলা ডিগ্রি কলেজ মাঠে আব্দুল মজিদকে গুলি করে। পরে গুলিবিদ্ধ আব্দুল মজিদ মারা যান। ২৪ এপ্রিল রাতে মিঠাপুর গ্রামে আমার এক বন্ধুর বাসায় অবস্থান করি। পরের দিন সকালে সেখান থেকে মুথরাপুর, গয়েশপুর, ধামইরহাট থানা কামাড়পাড়া অতিক্রম করে রাত ৮.০০ ভারতে প্রবেশ করি। পরে ভারত থেকে দেশে ফিরে লোকমুখে শুনি যে, বেলার মাঠে শত শত মানুষ শহিদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গাড়োয়ানরাও রয়েছে। লোকমুখে শোনা যায় মৃতের সংখ্যা হাজারের উপর।

মোঃ আব্দুল হাই (৭২)

পিতা: আলহাজ্ব আব্দুর রহিম, গ্রাম: পুরাতন বাজার, ডাকঘর: আক্কেলপুর, উপজেলা: আক্কেলপুর, জেলা: জয়পুরহাট সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

মোঃ আব্দুল হাই

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় পাকিস্তানি আর্মিরা ক্যাম্প স্থাপন করে। আর্মি ক্যাম্প স্থাপনের পর পরই এখানে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। শান্তি কমিটির সভাপতি ছিলেন রোয়াইর গ্রামের মওলানা আব্দুর রহিম। অন্যান্য সদস্যরা হলেন মকবুল কবিরাজ, মতিউর রহমান (তৎকালীন চেয়ারম্যান সোনামুখী ইউনিয়ন পরিষদ), নূর বক্ত সরদার ও সাত্তার কবিরাজ। এই ক্যাম্পের অধীনে কয়েকটি পাকিস্তানি চেকপোষ্ট গড়ে উঠে। এই ক্যাম্প গুলিতে শান্তি কমিটির সদস্যরা নিয়মিত যোগাযোগ ও তথ্য সরবরাহ করতো। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সন্ধান দিত। মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামীলীগ সমর্থকদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতো। রাজাকার আলবদর তৈরিতে পাকিস্তানি বাহিনীদের সহায়তা করতো। আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন ছিলেন ক্যাপ্টেন হারুন। ক্যাপ্টেন হারুনের নির্দেশে আশে পাশের গ্রামে নির্যাতন,

অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। পাকিস্তানি ক্যাম্প হওয়ার পর আক্কেলপুরের অধিকাংশ লোক আত্নীয় স্বজনের বাড়ি পালিয়ে গিয়েছিল। আক্কেলপুর পৌরসভার হাস্তাবসন্তপুর, কাজিপাড়া, রোয়াইর, আমুট্ট্র, চকশান্তি, বিহারপুর, চক্রপাড়া, মাকিমপুর, সোনামুখী, সরদারপাড়া, হলহলিয়া প্রভৃতি গ্রামে শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকার সম্মিলিতভাবে বাড়ি বাড়ি তল্লাসি করতো, বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দিত, আটকের পর শারীরিক নির্যাতন করে বেলার মাঠ আমুট্ট্র বধ্যভূমিতে নিয়ে এসে গলা কেটে হত্যা করতো। গোপীনাথপুর, ভানুকান্দা, শান্তা, রামশালা, গণিপুর, চকরঘুনাথ ও চক্র পাড়াসহ বিভিন্ন গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ করতো। সাধারণ যুবকদের ধরে নিয়ে অত্যাচার ও গুলি করে মেরে ফেলতো। এছাড়া উল্লেখিত গ্রাম থেকে রাজাকারেরা মুলত রমজান আলী , নূর বক্ত সরদার পাকিস্তানি আর্মিদের মনোরঞ্জনের জন্য নারীদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে আসতো। তারপর যৌন নির্যাতনের পর ছেড়ে দিত।

মো: মোসলিম উদ্দিন সরকার (৬৩)

পিতা: মো: আহাদ আলী সরকার (ডা: বুলচান), গ্রাম: মাটিহাঁস, ডাকঘর: মামুদপুর, উপজেলা: ক্ষেতলাল, জেলা: জয়পুরহাট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

মো: মোসলিম উদ্দিন সরকার

আমি আমার ছোট দুই ভাই, বাবা মহিষের একটি গাড়ি ও একটি গরুর গাড়ি নিয়ে যাই। গোপীনাথপুর থেকে হিন্দু পরিবার নিয়ে যাচ্ছিলাম। সাথে মালামাল ও কাঁসার জিনিসপত্র ছিল। গরু ও মহিষের গাড়ি করে হিন্দু পরিবার ও মালামাল ভারতের বর্ডার পার করে দিলে কয়েক টাকা পাওয়া যেত। পথিমধ্যে বিহারিরা ধাওয়া করে কেউ কেউ আতংকে গাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আমার ছোট ভাই গরুর গাড়ি আগলে বসে ছিল। ছোট ভাইকে মিলিটারিরা মারবে কিন্তু পরে একজন মিলিটারি ‘বলিচে এ চাংরা মানুষ ছেড়ে দাও’। ছাড়া পায়ে ভাই বর্ডারে চলে যায়। আমার আরেক ভাই গাড়ি ছাড়ে বাড়ি আসে। আমি গাড়ি নিয়ে পিরোজপুর বর্ডারে এসে দেখি ছোট ভাই গাড়ি

পার 'করিচ্চে'। সকালে হিন্দুরা এসে মালামাল নিয়ে যায়। বাবা তখন বাড়ি থেকে 'খবর পাছে ছেলেরা গাড়ি নিয়ে মিলিটারিদের হাতে ধরা পড়িছে। বাবা পিরোজপুর বর্ডারে আমাদের নাগাল পাছে। সেখানে আমরা দুই দিন থাকনো।' বাবা গ্রাম্য ডাক্তার ছিলেন।

লোকজন বলল, যত ঔষধ লাগে দিব আপনি ডাক্তারি করেন। রাত ১১ টার দিকে তোফাজ্জল ভাই গাড়ি ছেড়ে দেয় বাড়ি যাওয়ার জন্য। গাড়ি ছেড়ে কিছুদূর যেতে মুক্তিরা আসে। মুক্তিরা বলল, বর্ডার পার হলে গুলি করবে। এর জন্য দায়ী কে হবে। আমার বাপ জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। মুক্তিবাহিনীদের তিনি বোঝালেন। মুক্তিবাহিনী চলে যাওয়ার ঘন্টা খানেক পর তোফাজ্জল গাড়ি ছাড়ে। আমি আমার ছোট ভাই আরও কয়েকজন ঘুমিয়ে। ঘুম থেকে চেতন পেয়ে দেখি সকল গাড়ি চলে গেছে। আমরা দ্রুত গাড়ি ছেড়ে সাথ ধরলাম। মঙ্গলবাড়ি এসে একটি ব্রিজের উপর দুই জন দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের ২৭ টি গরু ও মহিষের গাড়ি ছিল। পরে ৩০-৪০ জন শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারেরা অস্ত্র নিয়ে সামনের দিক থেকে এসে ঘিরাও করলো। আমরা দেখলাম, বাঁচার উপায় নেই। আমার ছোট ভাই ও গফুর দুই গরু নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। বাবা তখন বলল, তোমরা দুই ভাই পালিয়ে যাও, আমি গাড়িতে থাকি দেখি কী করা যায়। রাস্তার উপর গাড়ি আর নীচে পাটের জমি। আমি, ছোট ভাই, গফুর আরও কয়েকজন পাটের ভিউ দিয়ে পাশের গ্রামে পালিয়ে গেলাম। রাতে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে জয়পুরহাট হয়ে বাড়িত আসছি। বাপ গাড়ির সাথে চলে গেল। তিনদিন ঐখানে রাখছে। তাদের পালানোর সুযোগ দিয়েছিল। গরু ও মহিষের গাড়ি ছেড়ে কেউ পালাইনি। বিহারিরা ঐখানে গুলি করে ও পেটে চাকু মেরে কয়েকজনকে মেরেছে। বাবা রাতের অন্ধকারে নিধি গ্রামে মৃতদেহ চেক করেছে। বাবা মনে করেছে আমার ছেলে আছে কি না? বিনাই গ্রামের জাহিরের পেটে ছুরি মেরেছিল। পেট থেকে ভুরি বের হয়ে সে মারা গিয়েছিল।

মোঃ লুতফর রহমান (৭৫)

পিতা: ফজলুর রহমান, গ্রাম: পশ্চিম আমুট্র, ডাকঘর: আক্কেলপুর, উপজেলা: আক্কেলপুর, জেলা: জয়পুরহাট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, আক্কেলপুর, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

আনুমানিক ভাদ্র মাস। আমি শুনলাম কানুপুর রোয়াইর মাঠে রেললাইন পার হয়ে পূর্বদিকে মুক্তিযোদ্ধারা ধরা পড়ে। আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসা ছিল

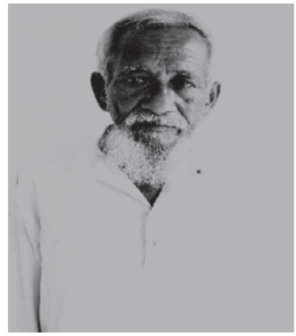

মো: লুতফর রহমান

ক্যাম্প। ক্যাম্পের মেজর ছিল আফজাল। একদিন পর দেখি, পশ্চিম আমুট্র গ্রামের আম গাছের নীচে, আমার বাড়ি থেকে দুই বিঘা ফাঁকে প্রায় ১৪ জন লোক ধরা পড়েছিল। একজন পাঞ্জাবি আমার বাড়িতে আসে। এসে বলতেছে, "মুক্তিযোদ্ধাকে কাঠনে হোগা"। ১৪ জনের হাত ও চোখ বাঁধা ছিল। দুডা দুডা করে নিয়ে আসতেছে। ধাক্কা দিচ্ছে আর ব্রাশ ফায়ার করতেছে। আমি ঐ আচরণ দেখে বাড়ি থেকে পালিয়ে নানার বাড়ি খাদাইল গেলাম। বাড়ির জানালা দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক হত্যাকান্ড নিজ চোখে দেখলাম। তারপর আমরা ১২-১৪ জন মিলে ভারতে ট্রেনিং করার জন্য দল গঠন করলাম। আমি বাড়ি ফিরে আসলাম এবং শুনলাম মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গোলাম মোহাম্মদ খোকন পাইকরকে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে গর্তে ফেলে দিছে। দা দিয়ে চোখ মুখ বিছিন্ন করিছে। মুক্তিযোদ্ধাদের খেজুরের কাঁটা দিয়ে শরীরে ছিদ্র, বিড়ির আগুন দিয়ে ক্ষত, জ্বালা যন্ত্রণা ও নির্যাতন করেছিল। বাংলা ভাদ্র মাসে একদিন ভোরে উঠে শুনি বেলার মাঠে পাঞ্জাবিরা মানুষ মেরে লাশ পুঁতে রেখেছে। তারপর আস্তে আস্তে যায়ে দেখি মাথা, পা বডি পড়েছিল, কুকুরে সেগুলো খাচ্ছিল।

মো: আব্দুর রাজ্জাক শাহ (৬৪)

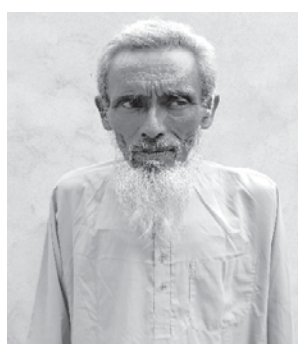

মো: আব্দুর রাজ্জাক শাহ

পিতা : লবির উদ্দীন শাহ্, গ্রাম: বেলতা বানদিঘী, ডাকঘর: মামুদপুর, উপজেলা: ক্ষেতলাল, জেলা: জয়পুরহাট, পেশা: কৃষি কাজ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

আনুমানিক পৌষ মাস। আমার চাচা গোপিনাথপুর বাজার থেকে মহিষের গাড়িতে বহু লোক নিয়ে রাত্রিতে চলে গেল। বর্ডারে পৌঁছলে পাকিস্তানি মিলিটারি ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গোলাগুলি হয়। তখন

আব্বারা ভারতের ভিতর চলে গেল। দুই তিন দিন ভারতে অবস্থানের পর বাড়ি আসার জন্য যোগাযোগ করতেছিল। শান্তি কমিটির সদস্যদের আব্বারা মোরগ জবাই করে খিলে আসার পথের লাইন ক্লিয়ার করে নিল। ভারত থেকে আসার পথে ডা: বুলু চান এর কথায় ধলাহার ইউনিয়ন হয়ে আসতেছিল। পাকিস্তানি মিলিটারিরা ও শান্তি বাহিনীর সদস্যরা তথা যৌথ বাহিনী আব্বাদের আটক করে। দুই হাত পিছনে বেঁধে জয়পুরহাট রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নিয়ে যায়। ঐখানে দুই দিন রেখেছিল। তারপর আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসার মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তিন দিন ক্যাম্পে রাখে। আব্বা ও চাচাদের দ্বারা বধ্যভূমির মাটি খুঁড়ে নিয়েছে। পরে আব্বা ও চাচাদের জবাই করে মেরে বধ্যভূমিতে পুঁতে রাখে। ঘটনার আনুমানিক ৫-৭ মাস পর উপজেলা প্রশাসন আক্কেলপুরের নির্দেশে আমি বধ্যভূমির মাটি খুঁড়লাম। সেখানে হাত পাচেক একটি বাঁশ পেলাম। মৃতদেহ সকলের তার দিয়ে হাত বাধা ছিল। গর্ত খুঁড়ে ২২ টি মাথা, হাড়-হুড্ডি ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পেলাম।

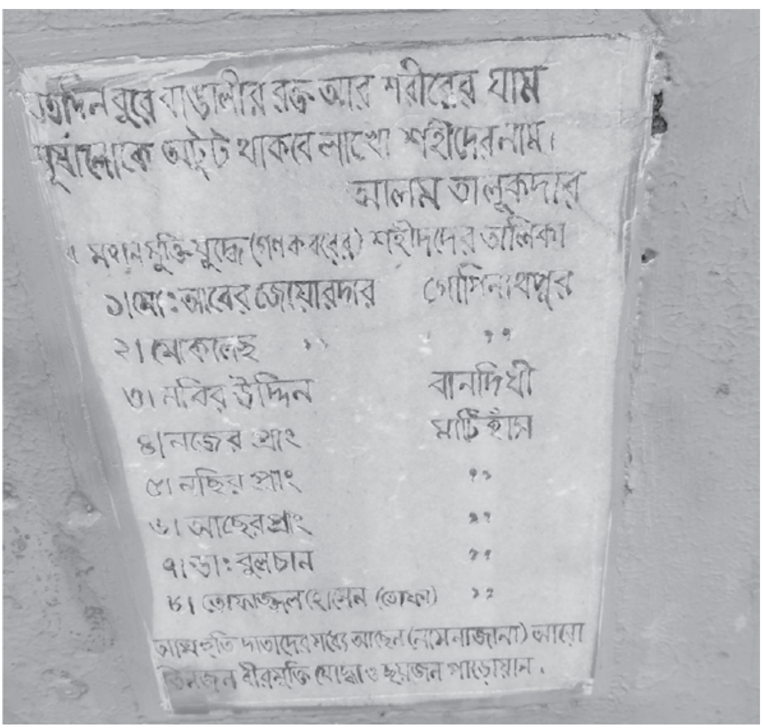

গণহত্যার শহিদদের নাম ফলক

স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়াস

বেলার মাঠের গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণে কিছু প্রয়াস নেয়া হয়েছে। রেল ব্রিজ সংলগ্ন, আক্কেলপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজের পিছনে রয়েছে বধ্যভূমি। বধ্যভূমির সামনে রয়েছে একটি শহিদ মিনার ফলক ও শহিদ গণকবর স্মৃতিসৌধ। ফলকে শহিদের তালিকা রয়েছে। শহিদের তালিকায় রয়েছে ০৮ জনের নাম। ১৬-১৭ জন গাড়োয়ান এবং কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রায় ৪০ জনের গণকবর রয়েছে। আক্কেলপুর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালে এখানে শহিদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা হয়। তৎকালীন আক্কেলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা নূর হোসেন তালুকদার এই গণকবরের উপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন।

মূল্যায়ন

স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদাররা তাদের এদেশীয় দালালদের নিয়ে সারা দেশে যেভাবে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, নির্যাতন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি বর্বরোচিত ঘটনা ঘটিয়েছে, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ঘৃণ্য কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে চিরদিন। ১৯৭১ সালে এ সমগ্র দেশই ছিল বধ্যভূমি। বেলার মাঠের গণহত্যার কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

প্রথমত, আক্কেলপুর বেলার মাঠের মধ্যে ফেলে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের অধিকাংশ ছিল শরণার্থী ও গ্রামের মানুষ। অনেককে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে গলাকেটে গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয়।বেলার মাঠের বধ্যভূমিতে মানুষের মাথা ভর্তি ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার পর পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাস্তায় ঘুরিয়ে নির্যাতন করে।

দ্বিতীয়ত, স্মৃতিস্তম্ভে শহিদের যে নামের তালিকা রয়েছে তা সরেজমিনে অনুসন্ধান করে দেখা যায়, এসব নাম ও ঠিকানা আংশিক ঠিক রয়েছে। গণকবরগুলোতে নিহত ব্যক্তিদের অধিকাংশ বহিরাগত।

তৃতীয়ত, সরকারি ও বেসরকারি ভাবে গণহত্যায় নিহতের পরিবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি ও আর্থিক সহায়তা পায়নি।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে গণহত্যার ঘটনাগুলো বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বহু সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি।

গ্রন্থ ও সংকলন

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১৩

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : অষ্টম খন্ড*, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪

আবুল কাশেম (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট*, জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট, ১৯৯৯

আমিনুল ইসলাম বাবুল, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাসঃ জয়পুরহাট জেলা*, ঢাকা, তাম্রলিপি, ২০১৭

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *জয়পুরহাটের গণহত্যা*, জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট, ২০২১

আবদুস সাত্তার মৃধা, *জয়পুরহাটের ইতিহাস*, বিজয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রফেসর ফারুক আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে আক্কেলপুর*, সি, এস কম্পিউটার্স এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, বগুড়া, এপ্রিল ২০২২

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯

সাক্ষাৎকার

রাজেন্দ্র প্রসাদ আগরওয়ালা (৬৯), মুক্তিযোদ্ধা, পেশাঃ আইনজীবী ও গণমাধ্যমকর্মী, পিতাঃ জয়দেব আগরওয়ালা, গ্রামঃ পুরাতন বাজার, ডাকঘরঃ আক্কেলপুর, উপজেলাঃ আক্কেলপুর, জেলাঃ জয়পুরহাট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মোঃ আব্দুল হাই (৭২), মুক্তিযোদ্ধা, পেশাঃ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, আক্কেলপুর উপজেলা কমান্ড, পিতাঃ আলহাজ্ব আব্দুর রহিম, গ্রামঃ পুরাতন বাজার, ডাকঘরঃ আক্কেলপুর, উপজেলাঃ আক্কেলপুর, জেলাঃ জয়পুরহাট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মোঃ লুতফর রহমান (৭৫), পেশাঃ মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, আক্কেলপুর উপজেলা কমান্ড, পিতাঃ ফজলুর রহমান, গ্রামঃ পশ্চিম আমুট্ট, ডাকঘরঃ আক্কেলপুর, উপজেলাঃ আক্কেলপুর, জেলাঃ জয়পুরহাট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, আক্কেলপুর।

মো: জামাল উদ্দীন (৬৮), পেশা : কৃষি কাজ, পিতা: মৃত মফিজ উদ্দিন, গ্রাম: ভান্ডারীপাড়া, ডাকঘর: কানুপুর, উপজেলা: আক্কেলপুর, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মো: আবু বক্কর সিদ্দিক মন্ডল (৬৮), পেশা: ব্যবসা, পিতা: মৃত নূরুল ইসলাম, গ্রাম: পূর্ব খাদাইল, ডাকঘর: মিঠাপুর, উপজেলা: আক্কেলপুর, জেলা: জয়পুরহাট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মো: আব্দুর রাজ্জাক শাহ (৬৪), পেশা : কৃষি কাজ, পিতা : লবির উদ্দীন শাহ্, গ্রাম: বেলতা বানদিঘী, ডাকঘর: মামুদপুর, উপজেলা: ক্ষেতলাল, জেলা: জয়পুরহাট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মো: মোসলিম উদ্দিন সরকার (৬৩), পেশা: ব্যবসা, পিতা : মো: আহাদ আলী সরকার (ডা: বুলচান), গ্রাম: মাটি হাঁস ডাকঘর: মামুদপুর, উপজেলা: ক্ষেতলাল, জেলা: জয়পুরহাট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

পরিশিষ্ট ০১

আক্কেলপুরের বেলার মাঠের গণহত্যায় শহিদদের নামের অসমাপ্ত তালিকা

ক্র.ন.	নাম	পিতার নাম	বয়স	ঠিকানা	পেশা
০১	আব্দুল মজিদ	আব্দুল খালেক	২৪	বেগুনবাড়ি, কানুপুর	ছাত্র
০২	মো: আজিম মাঝি	আলাউদ্দিন মাঝি	১৮	হাস্তাবসন্তপুর, আক্কেলপুর	ছাত্র
০৩	মো: ফেরদৌস মন্ডল	ভুরু মন্ডল	১৮	বেগুনবাড়ি, কানুপুর	ছাত্র
০৪	আবের জোয়ারদার	মৃত আজুল্লা জোয়ারদার	৭০	গোপিনাথপুর	ব্যবসায়ী
০৫	মোকলেছ জোয়ারদার	আবের জোয়ারদার	৫০	গোপিনাথপুর	গারোয়ান

ক্র.ন.	নাম	পিতার নাম	বয়স	ঠিকানা	পেশা
০৬	লবির উদ্দীন শাহ্	বশির শাহ	৬০	বেলতা বানদিঘী, মামুদপুর	কৃষি কাজ
০৭	মোয়াজ্জান উদ্দীন শাহ্	বশির শাহ্	৫০	বেলতা বানদিঘী, মামুদপুর	কৃষি কাজ
০৮	আমজাদ উদ্দীন শাহ্	বশির শাহ্	৪৫	বেলতা বানদিঘী, মামুদপুর	কৃষি
০৯	আহাদ আলী সরকার (বুলচান)	মৃত আরজালি সরকার	৫৫	মাটিহাঁস, বানাইচহাট	ডাক্তার, আমিন
১০	মো: অছির আকন্দ	মৃত লবিন আকন্দ	৫৫	মাটিহাঁস, বানাইচহাট	কৃষি কাজ
১১	মো: নজের আকন্দ	মৃত লবিন আকন্দ	৫০	মাটিহাঁস, বানাইচহাট	কৃষি কাজ
১২	ভিকন আলী প্রামানিক	তিন করিয়া প্রামানিক	৬৫	মাটিহাঁস, বানাইচহাট	কৃষি কাজ
১৩	তোফাজ্জল হোসেন	গুলো খাঁ	৬৫	বেলতা বানদিঘী, মামুদপুর	কৃষি কাজ
১৪	আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল	মৃত আব্দুর রহিম মন্ডল	৩৫	বেগুনবাড়ি, কানুপুর	আমিন
১৫	ফেরদৌস মন্ডল	মৃত আব্দুর রহিম মন্ডল	১৬	বেগুনবাড়ি, কানুপুর	ছাত্র
১৬	আব্দুল মান্নান ফকির	ইসমাইল ফকির	৩৬	ঘলহলিয়া, জাফরপুর	কৃষি কাজ
১৭	এ, কে এম ফজলুল করিম	আলহাজ্ব আব্দুর রহিম মন্ডল	১৬	আক্কেলপুর	ছাত্র

পরিশিষ্ট ০২

স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকা

ক্র. ন	রাজাকারের নাম	পিতার নাম	পেশা	ঠিকানা
১	আমজাদ হোসেন	মৃত ভূরঙ্গা মন্ডল	কৃষি	হাস্তাবসন্তপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
২	গোলাম মোস্তফা	মৃত ডা: তাজিম উদ্দীন	ব্যবসা	হাস্তাবসন্তপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৩	আবু সামা (বাবলু)	মৃত আলাউদ্দিন (পচা)	কৃষি	হাস্তাবসন্তপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৪	মকবুল হোসেন	অজ্ঞাত	কৃষি	হাস্তাবসন্তপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৫	আবুল হোসেন	মৃত আহাম্মাদ আলী	কৃষি	চক্রপাড়া, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৬	মৃত সাহাদৎ হোসেন	অজ্ঞাত	কৃষি কাজ	আমুট্র, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৭	সুজন মন্ডল	অজ্ঞাত	ব্যবসা	চক্রপাড়া, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৮	মতিউর রহমান	মজিবর রহমান	কৃষি কাজ	মাকিমপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৯	সোলেমান আলী	অজ্ঞাত	কৃষি কাজ	মাকিমপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
১০	আমজাদ হোসেন	মৃত আব্দুল মন্ডল	কৃষি কাজ	মাকিমপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
১১	ছলিম উদ্দীন	মৃত লুজির মন্ডল	ব্যবসা	সোনামুখী, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
১২	হাজী নফিল উদ্দীন	অজ্ঞাত	কৃষি কাজ	সোনামুখী সরদারপাড়া, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
১৩	মতিয়র রহমান	মজিবর রহমান	কৃষি কাজ	মানিকপুর, চক্রপাড়া, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট

ক্র. ন	শান্তি কমিটি ও দোসরদের নাম	পিতার নাম	পেশা	গ্রাম ও ডাকঘর
১	মতিউর রহমান	মকবুল মন্ডল	ব্যবসা	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
২	মকবুল কবিরাজ	অজ্ঞাত	ব্যবসা	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৩	আবুল কাশেম মাষ্টার	অজ্ঞাত	শিক্ষক	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৪	মীর আব্দুল ওয়াহেদ	অজ্ঞাত	কৃষি কাজ	হাজীপাড়া, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৫	ইয়াকুব আলী কবিরাজ	অজ্ঞাত	ব্যবসা	পশ্চিমবাজার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৬	নূর বক্ত সরদার	ওছমান সরদার	চুরি	রোয়াইর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৭	নূর মোহাম্মদ গোলা	অজ্ঞাত	কৃষি কাজ	চকশান্তী, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৮	ইসমাইল হোসেন আকন্দ	অজ্ঞাত	কৃষি কাজ	পশ্চিমবাজার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
৯	আছির উদ্দীন মাষ্টার	অজ্ঞাত	ব্যবসা	পুরাতনবাজার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
১০	আ: গনি কবিরাজ	ছোলেমান আলী কবিরাজ	কবিরাজ	পশ্চিমবাজার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
১১	আফজাল হোসেন	অজ্ঞাত		পশ্চিমবাজার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট

ক্র. ন	শান্তি কমিটি ও দোসরদের নাম	পিতার নাম	পেশা	গ্রাম ও ডাকঘর
১২	আজিম উদ্দীন	এাফেজ উদ্দিন		পশ্চিমবাজার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
১৩	আজিমুদ্দীন সরদার	মাফেজ সরদার	রোয়াইর	পশ্চিমবাজার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
১৪	কাজমদ্দীন সরদার	মফেজ সরদার	রোয়াইর	পশ্চিমবাজার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
১৫	নজিবর রহমান	ওসমান সরদার	রোয়াইর	পশ্চিমবাজার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
১৬	ছামাদ মন্ডল	আঃ রশিদ মন্ডল	রোয়াইর	পশ্চিমবাজার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট

সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, আক্কেলপুর উপজেলা কমান্ড, ডাক ও থানা : আক্কেলপুর, জেলা : জয়পুরহাট। চিঠির সূত্র নং-মু/আ/শক/দারা/অলিকা-১০/১০, তারিখ : ০৯/১২/ ২০১০খ্রি।

ন' মাসের শিশুও রক্ষা পায়নি পাকিস্তানী ঘাতকদের গুলি থেকে
কুমিল্লা, ১৯৭১। ছবি: ম্যারিলিন সিলভারস্টোন

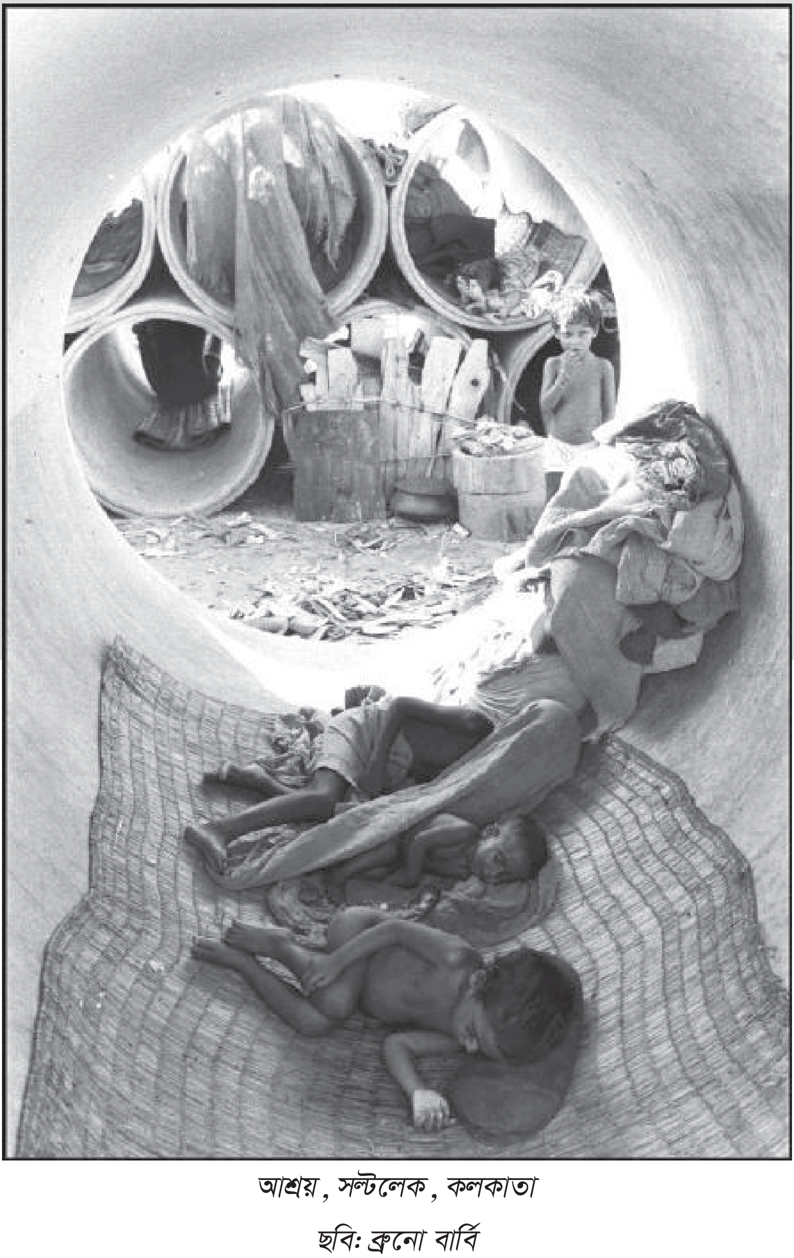

আশ্রয়, সল্টলেক, কলকাতা

ছবি: ব্রুনো বার্বি